বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব-১)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

সময়ের সাথে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন মূলত সময়েরই সমষ্টি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাই জীবন। অন্তহীন প্রবহমান সময়ের একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়ে আরেকটি নির্দিষ্ট ক্ষণে আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেই। হয়তো বা রেখে যাই কিছু স্মৃতি- মহাকালের বুকে যা সঞ্চিত হয় ইতিহাসের বারিবিন্দু হিসাবে। সময়ের সাথে তাই ইতিহাসেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। সময়ের অতীত ধারাবাহিকতাই ইতিহাস। আমাদের ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও বিভিন্ন বিচিত্র মানব-কৃতিও বিভিন্ন যুগ ও সময়ের ক্রমাবদান। সে হিসাবে সময় আমাদের জীবন ও কৃতির একান্ত সারথি।

অতএব, সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করেই সময়কে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও হিসাবের মধ্যে আনার জন্য একে নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিধিতে বিভক্ত করা হয়েছে। পল, অনুপল, সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী, সহস্রাব্দ ইত্যাদি নানা ভাগে ও পরিচয়ে সময়কে বিভক্ত করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু নিয়ে সৃষ্টি হয় বিশাল অতল বারিধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণার সমষ্টিতে গড়ে ওঠে বিস্তীর্ণ ধূসর মরুভূমি। সময়ের পল-অনুপল, সেকেন্ড, মিনিট নিয়েও তেমনি সৃষ্টি হয় সীমাহীন অনন্ত কাল-মহাকাল। ইতিহাস সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে শত-সহস্র-কোটি পল-অনুপল-মুহূর্তের ঘন সন্নিবদ্ধ সাঁকো-বন্ধন। আমাদের জীবনও পল-অনুপল-মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। পদ্ম-পত্রে অস্থির, চঞ্চল নীরের মত তার অবস্থান। তবু ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাথে সময় ও ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রতিটি মুহূর্ত বা সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত আমাদের জীবন যেখানে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, সীমাবদ্ধকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেখানে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান এবং যথাযথভাবে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মধ্যেই এর সার্থকতা। প্রতিদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যে দিনটির শুরু হয়, সূর্যাস্তের পর সেটি আর কখনো ফিরে আসে না। পরের দিন সূর্যোদয়ের সাথে আরেকটি নতুন দিনের আগমন ঘটে, পূর্বের দিনটি অতীতের তথা মহাকালের অন্তহীন বুকে বিলীন হয়। এভাবে ক্রমাগত একটির পর একটি নতুন দিন আসে এবং বিগত দিনগুলো স্মৃতিময় অতীত বা ইতিহাসে পর্যবসিত হয়।

এভাবে বর্তমান মুহূর্তগুলো প্রতিনিয়ত অতীত বা ইতিহাসের অন্তহীন গর্ভে বিলীন হয়। একইভাবে দিনরাত্রির পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের এক পর্যায়ে এ নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে, অসংখ্য নতুন জীবনের আগমন ঘটে পৃথিবীতে। ফলে মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীকুলের অবস্থাও তাই। সময়ের ধারা যেমন অব্যাহত, জীবনের ধারাও তেমনি। কিন্তু একটি জীবনের অবস্থান পদ্ম-পত্রে নীর সদৃশ সময়ের বক্ষপুটে অস্থির, চঞ্চল নীরের মতই ক্ষণস্থায়ী। অতএব, সময়ের আবর্তন, দিনরাত্রির আগমন-নির্গমন অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ, জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ থেকে যেমন মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তেমনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সঠিক রূপে কাজে লাগানোর ব্যাপারেও বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৯০)

এভাবে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, দিন-রাত্রির আগমন-নির্গমন, ঋতু-বিবর্তন ইত্যাদি বিষয় অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সময়ের সদ্ব্যবহারে যত্নবান হতে পারি। আল্লাহর সৃষ্টি-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি।

জীবন মূলত সময়ের সমষ্টি, একথা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। দিনরাত্রির বিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষ দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়, আবার নির্দিষ্ট আয়ূশেষে বিদায় গ্রহণ করে। এ আবির্ভাব ও বিদায় মহান স্রষ্টার বিধান ও নির্দেশানুযায়ী এমন নীরবে-সংগোপনে সংঘটিত হয় যে, আমরা সর্বদা তা উপলব্ধি করতেও সক্ষম হই না। অথচ এ আবির্ভাব ও বিদায়ের মধ্যবর্তী সময় যেটাকে আমরা □হায়াত□ বলি, তা প্রত্যেকের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনটি কেমন কাটলো, দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে ব্যয়িত হলো, এ দিনটিতে কতটা অর্জন বা সঞ্চয় হলো, এ অর্জন বা সঞ্চয় জীবনে কতটা সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে এল, অধিকাংশ সময় তা আমরা খতিয়ে দেখিনা।

এই যে সঞ্চয় বা অর্জনের কথা বললাম তা দু□রকম : একটি বস্তুগত, অন্যটি অবস্তুগত। একটি দৃশ্যমান, অন্যটি উপলব্ধিগত। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুগত প্রাপ্তিতে সকলেই পরিতুষ্ট। তবে, অবস্তুগত প্রাপ্তি হয়ত সত্যিকার জ্ঞানী-বোদ্ধাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহান স্রষ্টা সময়ের শপথ নিয়ে বলেনঃ □কসম সময়ের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হকের দাওয়াত দেয় ও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।□ (সূরা আল-আছর : আয়াত-১-৩)

সময়ের সমষ্টিই জীবন, সে সময়ের শপথ নিয়ে আল্লাহ মানুষকে দু□শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপরীত। প্রথম শ্রেণীর সুস্পষ্ট পরিচয় না দিয়ে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচয়ের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যেসব গুণে গুণান্বিত তার বিপরীতটাই প্রথম শ্রেণীর পরিচয় জ্ঞাপক। এটা আল-কুরআনের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন: তারা ঈমানদার (স্রষ্টায় বিশ্বাসী), সৎকর্মশীল, পরস্পরকে অর্থাৎ অন্য সকলকে হকের (সত্য দ্বীন) দাওয়াত দেয়, নিষ্ঠার সাথে হকের পথে চলার জন্য জীবন পথের সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় প্রদান করে থাকে। অন্য শ্রেণীর মানুষ এর বিপরীত। উপরোক্ত গুণাবলী থেকে তারা বঞ্চিত। আল্লাহ্ এ দু□শ্রেণীর মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে এবং উভয়ের চরম পরিণতির কথা বলতে গিয়ে সময়ের কসম খেয়েছেন। এতে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জনৈক মনীষী জীবনকে বরফের সাথে তুলনা করেছেন। বরফ তার বিক্রেতার নিকট মূল্যবান পুঁজি। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে সে পুঁজি একসময় যখন গলে পানি হয়ে যায়, তখন তার পুঁজি আর অবশিষ্ট থাকে না। জীবনও তেমনি সময়ের অদৃশ্য ভেলায় চড়ে একসময় অনন্তের পথে বিলীন হয়। আমাদের মরদেহও তখন বরফগলা পানির মতোই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই সময় থাকতেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা কর্তব্য। সময়ের গুরুত্বটা এখানেই। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : □পাঁচটি বিষয়ের প্রতি (সময় থাকতেই) গুরুত্ব আরোপ কর : বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের, রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে স্বাস্থ্যের, দারিদ্র্য আসার পূর্বে স্বচ্ছলতার, ব্যস্ত হবার পূর্বে অবসর সময়ের, এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের।□

সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত হাদীসে বিভিন্নভাবে তাই সময়ের গুরুত্বটাই বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে। সময়ের সাথে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এখানে সেটাই গুরুত্ব সহকারে বুঝানো হয়েছে এবং সময়কে যথাসময়ে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

হিসাবের সুবিধার জন্য নানা যতিচিহ্ন দিয়ে অখণ্ড সময়কে নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিসরে বিভক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনার জন্য শতাব্দী, সহস্রাব্দ ইত্যাদির হিসাবটা স্বাভাবিক, কিন্তু একটি জীবনের জন্য তা অতিশয় দীর্ঘ। সহস্রাব্দ তো অকল্পনীয়, শতায়ূ হবার নসীবই ক□জনের ভাগ্যে ঘটে? দশক, বছর, মাস বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র সময়-পরিসরকে কেন্দ্র করেই জীবনের সকল ভাবনা, পরিকল্পনা ও কর্মায়োজন। জীবনের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মায়োজনকে একটি সুষ্ঠ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্য সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ ইত্যাদি গণনার সূত্রপাত। জীবনে আমাদেরকে অনেক কিছু করার প্রয়োজন হয়। হিসাব করে নিয়মমাফিক সবকিছু না করলে জীবনে সাফল্য আসে না। সেজন্যই মানুষ সময় নিরূপণের জন্য ঘড়ি আবিষ্কার করেছে, দিন-তারিখ মেলাবার জন্য পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি তৈরি করেছে। আমরা এখন ঘড়ি, পাঁজি-পুঁথির হিসাব অনুযায়ী চলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। এসব আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ দিন-রাত্রির আবর্তন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমণ, ঋতুর পরিবর্তন, প্রকৃতির দৃশ্যমানতার বিবর্তন, জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন মানুষ সময়কে অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

মহান স্রষ্টা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সন গণনার সূচনা করেছেন। এদিক থেকে মানুষের যিনি স্রষ্টা, তিনিই আদিকাল থেকে সনের সৃষ্টি করেছেন। দিন-ক্ষণ, মাস-বছর ইত্যাদি গণনার সূত্রপাত হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। মহামহিম

আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট বছর গণনার মাস বারোটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬, আংশিক)

> পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সনের উৎপত্তি হলেও প্রত্যেক সনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রতি সনের মাসের সংখ্যা বারো। অবশ্য প্রত্যেক সনের মাসের সংখ্যা বারো হলেও, প্রতি মাসে দিনের সংখ্যা বা প্রতি সনে বর্ষের দিন সংখ্যায় তারতম্য রয়েছে। এর কারণ কোন সন চন্দ্রের হিসাব এবং কোন সন সূর্যের হিসাবে চলে। চন্দ্রের হিসাবে নিরূপিত সনকে চান্দ্রবর্ষ এবং সূর্যের হিসাবে নিরূপিত সনকে সৌরবর্ষ বলে। চান্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিন ৯ ঘন্টায় এবং সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায়। ফলে চান্দ্রবর্ষ অপেক্ষা সৌরবর্ষ ১০/১১ দিন বড়। সৌরবর্ষ সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বাৎসরিক ঋতু-পরিক্রম বা মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তিত হয়। ফলে আমাদের হিসাব ও গণনার কাজে বিশেষ সুবিধা হয়। তাছাড়া, অমাবষ্যা, পূর্ণিমা, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা ইত্যাদি চন্দ্র-পরিক্রমণের সাথে যুক্ত। চান্দ্রবর্ষ চন্দ্র-পরিক্রমের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এবং সৌরবর্ষ থেকে এটা ১০/১১ দিন কম হওয়ায় রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদতসমূহ পালনে সুবিধা হয়। বিশ্বের সব অঞ্চলের মানুষই বছরের সব ঋতুতে ঘুরে-ফিরে রমযান, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি পালনের সুযোগ পায়। অন্যথায়, কোন দেশে প্রতি বছর শুধু শীতকালেই রমযান পালিত হতো, আবার কোন দেশে শুধু গ্রীষ্মকালেই রমযানের আগমন ঘটতো। তা হতো ন্যায়বিচার বা ইনসাফের খেলাফ। কিন্তু মহান স্রষ্টার বিধানে কোন অবিচার বা বৈষম্য নেই। তাই তিনি এসব ইবাদতকে চান্দ্রবর্ষের সাথে সংযুক্ত করে পৃথিবীর সব অঞ্চলের সকল মানুষের প্রতি সুবিচার করেছেন। বান্দার প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। এ নিয়ামত ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। (সূরা আন্‌আম : আয়াত-৯৬)

আল্লাহ্ বলেনঃ তিনিই সূর্যকে তেজষ্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ কোন কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সব কিছুর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা য়ূনুস : আয়াত-৫ ও ৬)

আল্লাহ্ অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র দুটি স্পষ্ট নিদর্শন। একটি তেজষ্কর, অন্যটি জ্যোতির্ময়। একটি জগতের তাবৎ প্রাণিকূলকে নানা কর্মের আয়োজনে সজাগ ও কর্মচঞ্চল করে তোলে, অন্যটি বিশ্রাম ও নিদ্রার স্বপ্নময় ভুবনে নিয়ে যায়। এ দুটি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর সুনির্দিষ্ট পরিক্রমের ফলে দিন-রাত্রি, মাস-বছর, ঋতু-তিথির হিসাব সংরক্ষণ এমনকি, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র পরিক্রম করে নির্ধারিত কক্ষপথে। (সূরা আর-রাহমান : আয়াত-৫)

আল্লাহ রাত ও দিনের নিদর্শনদ্বয়ের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শন অপসারিত (অর্থাৎ অন্ধকারে আচ্ছাদিত) করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব নিরূপণ করতে পার। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-১২)

দিন ও রাত্রি, চন্দ্র এবং সূর্যের নির্দিষ্ট আবর্তন ও তার গূঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, সকল কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল (এ হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ চান্দ্রমাসকে ২৮টি মনযিল বা তিথিতে বিভক্ত করেছেন); অবশেষে তা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৭-৪০)

পৃথিবীতে বিভিন্ন সন বা বর্ষপঞ্জি আবিষ্কারের পিছনে বিশেষ ঘটনা বা ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন মিসরীয় পণ্ডিতগণ বছরের পর বছর নীলনদের জোয়ার-ভাটা ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে বছর গণনার রীতি চালু করেন। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ঈসা-পূর্ব ৪৬ অব্দে মিসর জয় করে মিসরীয়দের মধ্যে প্রচলিত সৌরবর্ষ বা ঋতুচক্রের হিসাবে প্রণীত পঞ্জিকা

সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। সিজার মিসরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী সোসিজেনিসের সহযোগিতায় রোমান বর্ষপঞ্জির ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি রোম-সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম সৌরবর্ষ পঞ্জিকার প্রচলন করেন। ইতঃপূর্বে ইংরেজি নববর্ষ ১ মার্চ থেকে গণনা করা হতো। সিজার এর রীতি পরিবর্তন করে ১ জানুয়ারি থেকে নববর্ষ গণনা শুরু করেন। তখন থেকে প্রাচীন রোমান বর্ষপঞ্জির নাম হয় সিজারিয়াস বর্ষপঞ্জি। রোম নগরীর পত্তনকালের স্মরণে রোম বা সিজারিয়াস বর্ষপঞ্জির সূত্রপাত।

বর্তমান বিশ্বে ক্রিশ্চিয়ান এরা বা খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ ঈসাব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ সনের প্রবর্তন হয় হযরত ঈসা (আ.) বা খ্রীস্টানদের নিকট যিনি যীশু খ্রীস্ট নামে পরিচিত তাঁর স্মরণে। অবশ্য হযরত ঈসার জীবিতাবস্থায় নয়; তাঁর মৃত্যুর ৭৫০ বছর পর রোমের খ্রীস্টান পাদ্রীগণ এ বর্ষগণনা শুরু করেন। পরবর্তীতে ইউরোপ-আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের বিস্তৃত জনপদে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারিত হবার ফলে এবং তারও পরে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত হবার ফলে খ্রীস্টাব্দ বা ঈসাব্দও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও প্রচলিত সর্বাধিক জনপ্রিয় সন এটা। ইংরেজ আমল থেকে আমাদের দেশেও এর প্রচলন ঘটেছে, এমনকি, কার্যত বাংলা সনের চেয়েও এর প্রচলন ও জনপ্রিয়তা অধিক। সরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষায়তন ইত্যাদি সর্বত্র ইংরেজি সনের প্রচলন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। ইংরেজ আমলে এ রীতি চালু হয়েছে, স্বাধীনতার পরও তা অব্যাহত রয়েছে।

ঈসাব্দের পরেই দ্বিতীয় প্রধান আন্তর্জাতিক সন হিসাবে হিজরী সনের প্রচলন ও এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়। আগে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র রাজকার্য বা সরকারীভাবে হিজরী সনের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার স্থান দখল করেছে ঈসাব্দ বা খ্রীস্টাব্দ। তবে তার পাশাপাশি হিজরী সন এখনো টিকে আছে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র। অন্য কোন কারণে না হলেও একমাত্র ধর্মীয় কারণে এ সন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা অনিবার্যভাবে টিকে আছে ও থাকবে। কারণ রোযা, হজ্জসহ ইসলামের বহু ইবাদত যেমনঃ দুই ঈদ, শবে কদর, শবে বরাত, আশুরা, ঈদে মিলাদুন্নবী, আখিরী চাহার সোম্বা ইত্যাদি সরাসরি হিজরী সন বা চান্দ্রমাসের সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় পর্বঃ বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব-২)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৬০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।